বর্ডার ওয়ার'স

সীমান্ত সংঘাত, ভূরাজনীতি ও ভবিষ্যৎ পৃথিবীর হুমকি

বর্ডার ওয়ার'স

সীমান্ত সংঘাত, ভূরাজনীতি ও ভবিষ্যৎ পৃথিবীর হুমকি

মূল

ক্লাউস ডডস

অনুবাদ : সাইফুদ্দিন আহমেদ

সম্পাদনা : ডা. আবু বকর সিদ্দীক

নতুন প্রজন্মের প্রকাশনা
ইন্তিফাদা
বুকস

বর্ডার ওয়ার’স

সীমান্ত সংঘাত, ভূরাজনীতি ও ভবিষ্যৎ পৃথিবীর হুমকি

মূল	ক্লাউস ডডস
অনুবাদ	সাইফুদ্দিন আহমেদ
সম্পাদনা	ডা. আবু বকর সিদ্দীক
প্রথম প্রকাশ	বইমেলা, ২০২৫
প্রচ্ছদ	মুহারেব মুহাম্মাদ
বানান সমন্বয়	টিম ফাউন্টেন
পৃষ্ঠাসজ্জা	টিম ফাউন্টেন
স্বত্ব	প্রকাশক
প্রকাশক	আবদুর রহমান আদ-দাখিল
প্রকাশনা	ইন্তিফাদা বুকস
পরিবেশনা	ফাউন্টেন পাবলিকেশন্স
বিক্রয়কেন্দ্র	দোকান নং ২১, কওমি মার্কেট ১ম তলা, ৬৫/১ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ ফোন: +৮৮০ ১৭৬৮-৮৬৪৪২৮ (সেলস) +৮৮০ ১৭৮৯-৮৫৪৬০২ (অফিস)
অনলাইন পরিবেশক	rokomari - wafilife - boisodai
আইএসবিএন	৯৭৮-৯৮৪-৯৭৯৬০-৭-৭

মুদ্রিত মূল্য : ৫০০ ৳

সূচিপত্র

প্রকাশকের কথা । ৯

অনুবাদকের কথা । ১১

ভূমিকা । ১৪

প্রথম অধ্যায়
সীমান্ত : কী এবং কেন?

প্রাথমিক ধারণা । ২৭

সীমান্ত নিরাপত্তায় ব্যয় ও বিনিয়োগ । ৩০

সীমান্ত এবং একপাক্ষিক ইতিহাস । ৩৫

অভিবাসী এবং সীমান্ত । ৪২

সমুদ্র দখলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-চীন স্নায়ুযুদ্ধ । ৪৯

দ্বিতীয় অধ্যায়
সীমান্তের পরিবর্তন এবং পরিবর্তনশীল সীমান্ত

সীমান্ত হিসেবে হিমালয় পর্বতমালা । ৫৬

ইথিওপিয়ার বাঁধ এবং মিশরীয় নীলনদের পরিবর্তিত পানিপ্রবাহ । ৫৯

তুরস্কের বাঁধ এবং সিরিয়া-ইরাকের জনমিতির পরিবর্তন । ৬২

সিন্ধু নদে ভারত-পাকিস্তান পানিপ্রবাহ চুক্তির ভূরাজনীতি । ৬৫

ইতালি-অষ্ট্রিয়ার পরিবর্তনশীল সীমান্ত । ৬৮

কাশ্মীর অঞ্চলে ভারত-পাকিস্তানের পরিবর্তনশীল সীমান্ত । ৭১

আল্পস পর্বতমালার পরিবর্তনশীল সীমান্ত। ৭৮
পর্বত ও নদীকে কেন্দ্র করে চীনের সীমান্ত ম্যানিপুলেশান। ৮২

তৃতীয় অধ্যায়
জলরাশি যখন সীমান্ত

প্রাকৃতিক সীমান্ত হিসেবে জলরাশি। ৮৯
রাশিয়া-চীনের ওয়াটার বর্ডার। ৯৫
কোস্টারিকা-নিকারাগুয়ার ওয়াটার বর্ডার। ৯৯
আন্তঃরাষ্ট্রীয় নদী এবং লেক ব্যবস্থাপনা। ১০৪
লেক তুরকানাকেন্দ্রিক ইথিওপিয়া-কেনিয়া সীমান্ত। ১০৬
এশিয়া-আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে পানিপ্রবাহ নিয়ে বিরোধ। ১০৯
সীমান্ত হিসেবে লেক এবং নদী : সম্ভাবনা ও সংকট। ১১২
ভূ-গর্ভস্থ পানির সীমান্ত এবং বণ্টন। ১১৫
সীমান্ত হিসেবে সমুদ্র। ১১৮
ইউএনসিএলওএস-এর সমুদ্র-সীমা নির্ধারণ কার্যক্রম। ১২০
ওয়াটার বর্ডারের ভবিষ্যৎ। ১২৭

চতুর্থ অধ্যায়
জলরাশি যখন সীমান্ত

তাইওয়ান-ফিলিস্তিন-কসোভার অমীমাংসিত সীমান্ত। ১২৯
স্বীকৃতিহীন রাষ্ট্র তুর্কি সাইপ্রাস। ১৩৪
ভূমধ্যসাগরে সমুদ্র-সীমা নির্ধারণ নিয়ে বিরোধ। ১৩৯
এন্টার্কটিকার অমীমাংসিত সীমান্ত। ১৪৩
পশ্চিম সাহারার সীমান্ত সংঘাত। ১৫০
অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সীমান্ত। ১৫৬

পঞ্চম অধ্যায়
নো ম্যান'স ল্যান্ড

বিশ্বজুড়ে নো ম্যান'স ল্যান্ড। ১৬৩

রাজনৈতিক কারণে সৃষ্ট নো ম্যান'স ল্যান্ড। ১৬৫

দুর্ঘটনার মাধ্যমে সৃষ্ট নো ম্যান'স ল্যান্ড। ১৬৭

উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যবর্তী নো ম্যান'স ল্যান্ড। ১৬৯

এন্টার্কটিকার নো ম্যান'স ল্যান্ড। ১৭৩

উত্তর মেরুর নো ম্যানস'স ল্যান্ড। ১৭৬

আন্তর্জাতিক জলসীমার নো ম্যান'স ল্যান্ড। ১৮০

গভীর সমুদ্রের নো ম্যান'স ল্যান্ড। ১৮২

আমেরিকা এবং ইউরোপ মহাদেশের নো ম্যান'স ল্যান্ড। ১৮৭

ভূমধ্যসাগর এবং দক্ষিণ চীন সাগরের নো ম্যান'স ল্যান্ড। ১৯২

নো ম্যান'স ল্যান্ডের ভবিষ্যৎ। ১৯৫

ষষ্ঠ অধ্যায়
ঐতিহাসিক সীমান্ত বিরোধ

চীন এবং জাপান সাগরে সীমান্ত বিরোধ। ১৯৭

ভেনিজুয়েলা-গায়ানা সীমান্তের ঐতিহাসিক বিরোধ। ২০২

ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত বিরোধ। ২০৭

ফিলিস্তিন-ইসরায়েল সীমান্ত। ২১৪

সপ্তম অধ্যায়
স্মার্ট বর্ডার!

স্মার্ট বর্ডার এবং সীমান্ত দেয়াল। ২২৭

স্মার্ট বর্ডারের লাভ-ক্ষতি। ২২৯

স্মার্ট বর্ডার হ্যাকিং। ২৩১

বেক্সিট এবং স্মার্ট বর্ডার । ২৩৩
স্মার্ট বর্ডারের ভবিষ্যৎ । ২৩৫

অষ্টম অধ্যায়
মহাশূন্যেও সীমান্ত!

চূড়ান্ত সীমান্ত পানে । ২৩৯
অতিরিক্ত ভিড়, প্রতিযোগিতা এবং সংঘর্ষ । ২৪২
মহাকাশের শান্তিপূর্ণ ব্যবহার । ২৪৭
মহাশূন্যেও যানযট । ২৫৪
ডাটা মাইনিং থেকে স্পেস মাইনিং । ২৫৬
মহাকাশে আধুনিক প্রযুক্তির প্রভাব । ২৫৯
মহাকাশ পুলিশ । ২৬১
সীমান্ত সংঘাত এবং মহাকাশের শেষ সীমানা । ২৬৩

নবম অধ্যায়
ভাইরাসেরও সীমানা?

সীমান্ত ভিতরে এবং বাইরে । ২৭২
ভ্যাকসিন যখন ভূ-রাজনীতির হাতিয়ার । ২৭৫
মহামারি থেকে সীমানা শিক্ষা । ২৭৬
উপসংহার । ২৭৯

প্রকাশকের কথা

আদিকাল থেকে পৃথিবীর প্রায় সব দ্বন্দ্ব-বিবাদ আর সংঘাতেরই মূল কেন্দ্রে রয়েছে মাটি। মানুষ শুধু বেঁচে থাকার জন্য নয়, পরিচয়, নিরাপত্তা ও ক্ষমতার জন্যও মাটির দখলে লড়েছে। একটি টুকরো জমির জন্য গ্রামের গেরস্তদের বিবাদ থেকে শুরু করে বিশ্বযুদ্ধ—সবকিছুর মূলেই রয়েছে ভূমির মালিকানা, সীমান্তের নিয়ন্ত্রণ ও ভূসম্পদের দখল।

রাজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্র থেকে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, সাম্রাজ্য বিস্তার থেকে উপনিবেশবাদ, স্নায়ুযুদ্ধ থেকে বৈশ্বিক আধিপত্য—প্রতিটি যুগেই ভূখণ্ডের নিয়ন্ত্রণই নির্ধারণ করেছে কে শক্তিধর, কে দুর্বল। এই অমিত শক্তির নামই ভূরাজনীতি। বিশ্বের সব সংঘাত-সমঝোতা, শত্রুতা-মৈত্রী, যুদ্ধ-শান্তি—সবই ভূরাজনীতির দাবার বোর্ডে একেকটি চাল মাত্র। যে এই খেলা বোঝে, সে-ই রাজনীতির দক্ষ খেলোয়াড়। তাই ভূরাজনীতির অধ্যয়ন শুধু নীতিনির্ধারকদের জন্য নয়, বরং প্রতিটি সচেতন নাগরিকের জন্যও জরুরি।

ক্লাউস ডডস সমকালীন বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ ভূরাজনীতি বিশেষজ্ঞ। তার লিখিত বর্ডার ওয়ার'স বইটি সীমান্ত সংঘাত ও আধুনিক ভূরাজনীতির এক অনন্য বিশ্লেষণ। বার্লিন প্রাচীরের পতন থেকে ৯/১১, ফিলিস্তিন থেকে পাকিস্তান, উত্তর কোরিয়া থেকে ট্রাম্পের সীমান্তপ্রাচীর—সীমান্তসংঘাত কীভাবে বৈশ্বিক সম্পর্ক ও ক্ষমতার ভারসাম্য বদলে দিয়েছে, তা গভীরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই বইয়ে।

বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত, ভয়ংকর এবং অপ্রত্যাশিত সীমান্ত-সংঘাতগুলো আমাদের পরিবর্তনশীল আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জন্য কী অর্থ বহন করে? সীমান্ত বিশেষজ্ঞ ক্লাউস ডডস এই বইয়ে আগামী দিনের ভূরাজনৈতিক সংঘাতগুলো বিশ্লেষণ করেছেন। যেখানে গাজা উপত্যকা

থেকে মহাকাশ প্রতিযোগিতা পর্যন্ত—দৃশ্যমান ও অদৃশ্য উভয় ধরনের সীমান্তপ্রাচীরের প্রভাব তুলে ধরা হয়েছে এখানে।

এই বই সীমান্তের প্রকৃত তাৎপর্য তুলে ধরে—সীমান্ত কীভাবে তৈরি হয়, তা রাষ্ট্র ও জনগণের জন্য কী অর্থ বহন করে এবং এটি আমাদের রাজনৈতিক অতীত ও কূটনৈতিক ভবিষ্যৎকে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করে? আধুনিক বিশ্বব্যবস্থায় এটি অত্যন্ত জরুরি প্রশ্ন, কারণ সীমান্ত শুধু মানচিত্রের দাগ নয়—এটি শক্তির সমীকরণ, রাজনীতির কৌশল ও ভবিষ্যৎ নির্ধারণের মঞ্চ।

বাংলাদেশও এই ভূরাজনৈতিক খেলায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের নিরাপত্তা সংকট, রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যা, বঙ্গোপসাগরের বিশাল সম্পদ নিয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা—এসব ইস্যু আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা, কূটনীতি ও ভবিষ্যৎ অর্থনীতির জন্য গভীর প্রভাব রাখছে। আজকের বিশ্বে ভূরাজনীতি বোঝা মানে শুধু বৈশ্বিক সংঘাত বোঝা নয়, বরং নিজের দেশ, নিজের ভবিষ্যৎ ও নিজের নিরাপত্তাকে বোঝা।

বর্ডার ওয়ার'স কোনো গতানুগতিক বই নয়, বরং এটি একটি সময়োপযোগী পাঠ—যা আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের বাস্তবতা বুঝতে সাহায্য করবে। যারা বিশ্ব রাজনীতির দাবার বোর্ডে কেবল একটি ঘুঁটি হতে চান না, বরং কৌশলী খেলোয়াড় হিসেবে নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়তে চান, তাদের জন্য এই বই অপরিহার্য।

আবদুর রহমান আদ-দাখিল
প্রকাশক, ফাউন্টেন পাবলিকেশন্স
২৩-০২-২৫ খ্রিষ্টাব্দ

অনুবাদকের কথা

প্রাচীনকাল থেকেই সীমান্তের সাথে মানুষের লেনদেন। বিভিন্ন সাম্রাজ্যে কিংবা রাষ্ট্রে বহু আগে থেকেই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বসবাস। প্রাচীন কালে বিভিন্ন জাতিগুলোর মাঝে সীমান্ত হিসেবে বিদ্যমান ছিল দুর্গম পাহাড়-পর্বত, স্রোতস্বিনী নদী কিংবা অকূল সাগর। কিন্তু আধুনিক যুগে এসে এসব প্রাকৃতিক দুর্গম সীমানার পাশাপাশি সহজেই অতিক্রম করার মতো সীমান্তও দেখা যায়। ফলশ্রুতিতে সীমানা নিয়ন্ত্রণ, সীমানা বাড়ানোর জাতিগত অভিলাষ থেকে বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তেই সীমান্ত সংঘাত যেন বর্তমান বিশ্বরে অনিবার্য বাস্তবতা।

২০১৯ সালের শেষদিকে তুর্কি-লিবিয়ার সম্পাদিত মেরিটাইম ডিল ভূমধ্যসাগরের ভূ-রাজনীতিতে আমূল পরিবর্তন আনে। এই ঘটনা আমাকে সীমানা এবং সীমানার ভূ-রাজনীতি সম্পর্কে জানতে আগ্রহী করে তোলে। বিভিন্ন জার্নাল, বই এবং পত্রিকায় ঘেটে আমি বিভিন্ন দেশের সীমান্ত নিয়ে চমকপ্রদ ঝামেলা ও বৈরিতার সন্ধান পাই। মানচিত্র ও ভূরাজনীতি নিয়ে অনুসন্ধিৎসু যেকোনো মানুষের জন্য এই বিষয়ে জানার যথেষ্ট খোরাক রয়েছে। তবে বাংলা ভাষায় এরকম টপিকে মৌলিক পুস্তক তেমন একটা দেখতে পাইনি। এর মাঝে ২০২১ সালের দিকে আবু বকর সিদ্দীক ভাই ক্লাউস ডডস এর বর্ডার ওয়ার'স সহ ভূরাজনীতি সংক্রান্ত বেশকিছু ইংরেজি মৌলিক বই গিফট করেন। সংশ্লিষ্ট টপিকে আগ্রহী যেকোনো মানুষের জন্যই বইগুলো তৃপ্তিদায়ক। আর ভাইয়ের দাবি ছিল, আমি যেন বর্ডার ওয়ার'স বইটি অনুবাদ করি। ভাই যথেষ্ট সহযোগিতা করলেও আমার অলসতায় বইটি অনুবাদ হতে যথেষ্ট দেরি হয়। একইসাথে ফাউন্টেন পাবলিকেশন্সের কর্ণধার আব্দুর রহমান আদ-দাখিল ভাইও বইটি অনুবাদ করতে বিভিন্ন সময়ে পরামর্শ ও উৎসাহ দান করেছেন। আর এটি আমার অনূদিত প্রথম বই। ফলে বইয়ে কিছু ভুল ও দুর্বোধ্যতা থাকতে পারে। আশা করি, সচেতন পাঠক মহল তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং আমাদের নজরেও আনবেন।

বর্ডার ওয়ার'স বইটি আপনাকে কখনো নিয়ে যাবে কাশ্মীরের সুউচ্চ সিয়ানচেন হিমবাহের পাক-ভারত রণাঙ্গনে, কখনোবা আপনি নিজেকে খুঁজে পাবেন দক্ষিণ আমেরিকার কোস্টারিকা-নিকারাগুয়া সীমান্তের সান জুয়ান নদীতে। বিশ্ব কাঁপানো ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সীমান্তের বৈচিত্র্যতাও আপনি যেমন টের পাবেন, ঠিক আগামীদিনে বিশ্ব রাজনীতির সংঘর্ষের নতুন ক্ষেত্র হতে যাওয়া দক্ষিণ চীন সাগরের সীমানাও আপনাকে রোমাঞ্চিত করবে। এছাড়া বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিবাদের অন্যতম বিষয় যে 'পানি প্রবাহ', সে পানিপ্রবাহের গতিপথ ও এটি আটকে দেওয়ার রাজনীতিও বইটিতে পাওয়া যাবে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অমীমাংসিত সীমান্তের যুদ্ধাবস্থাসহ, স্বীকৃতিবিহীন বিভিন্ন জাতিরাষ্ট্রের সীমানা কিভাবে কাজ করছে, তারও বর্ননা রয়েছে এই বইটিতে। নো ম্যান'স ল্যান্ড থেকে গভীর সমুদ্রের ভূরাজনীতির জটিল বোঝাপড়াও বইটিতে আলোচিত হয়েছে। সর্বোপরি, বিভিন্ন অঞ্চলের বৈচিত্র্যময় সীমান্ত নিয়ে জানতে আগ্রহী যেকোনো পাঠকের জন্য বইটি প্রাথমিক জ্ঞানের উৎস হিসেবে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।

সর্বোপরি, সীমান্ত একটি পরিবর্তনশীল বিষয়। আর বর্তমান টালমাটাল সময়ে বিরাজমান সীমানাগুলো সংশ্লিষ্ট দেশের চিরস্থায়ী সম্পত্তি হিসেবে পরিগণিত হতে পারছে না। আফগানরা ডুরান্ড লাইন অতিক্রম করে বৃহত্তর পশতুন রাষ্ট্র গঠনে উদগ্রীব, ইসরায়েল তার ত্রিমুখী সম্প্রসারণের মাধ্যমে গ্রেটার ইসরায়েলের স্বপ্নে বিভার, প্রাচীন মিথকে ধারণ করে পাশ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলোকে করায়ত্ত করার মাধ্যমে ভারত তার অখণ্ড ভারতের নেশায় আসক্ত। এদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয়বারের মতো প্রেসিডেন্ট হতে না হতে কানাডার সীমানা বিলুপ্ত করে 'মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন' এর হুংকার দিচ্ছেন। রাশিয়া আশেপাশের বিভিন্ন রাষ্ট্রের একাংশ অধিগ্রহণ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন ২.০ কিংবা হারানো রুশ সাম্রাজ্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে যাচ্ছে। ইউরোপের রুগ্ন মানুষের খেতাব ঝেড়ে ফেলে তুর্কী তার উসমানীয় সাম্রাজ্যের পুনরুত্থানের মঞ্চ তৈরিতে ব্যস্ত। আমাদের বাংলাদেশের পাশ্ববর্তী মায়ানমারের আরাকান জাতি তাদের ৩০০ বছর আগে লুপ্ত রাষ্ট্র পুনরুদ্ধারে ঝাপিয়ে পরেছে। এই বিষয়টি বাংলাদেশের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সংখ্যা ও নামও বদলে দিতে পারে। একইসাথে ভারতের সেভেন সিস্টার্স ও বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলের

ঘটনাপ্রবাহ সামনের দিনগুলোতে আমাদের দেশের সীমান্তকেও আলোচনার কেন্দ্রে রাখতে পারে। আর তাই সচেতন পাঠকদের উচিত, বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের সীমান্ত সংঘাতের স্বরূপ বিশ্লেষণ, সংঘাত নিরসনে গৃহীত পদক্ষেপের পুনর্পাঠের মাধ্যমে এ অঞ্চলের আসন্ন সংকটকে বুঝতে পারা। আমাদের সবসময় মাথায় রাখতে হবে, সীমান্ত কোনো 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'-এর বিষয় নয়। আমাদের একাগ্রতা, জাতীয়বোধ ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির সমীকরণকে করায়ত্ত করার মাধ্যমে বিদ্যমান সীমানা যেমন আমরা সম্প্রসারিত করতে পারি কিংবা নিজেদের সীমান্তকে শক্তিশালী রাখতে পারি; ঠিক একইভাবে আমাদের রাজনৈতিক দুর্বলতা ও জাতীয় নিষ্ক্রিয়তা আমাদের জমিনকে সংকুচিত করতে পারে কিংবা আমাদের সীমান্তকে রক্তাক্ত করতে পারে।

সাইফুদ্দিন আহমেদ
কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
২-২-২০২৫ খ্রি.

ভূমিকা

১৯৮৭ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান পশ্চিম জার্মানির দ্বি-বিভক্ত বার্লিন শহরে একটি সরকারি সফরে গিয়েছিলেন। বিখ্যাত ব্র্যান্ডেনবার্গ গেটকে পিছনে রেখে বার্লিন শহরের ৭৫০ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানের মঞ্চে দাঁড়িয়ে সাবেক অভিনেতা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুই দুইবারের প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান প্রতিপক্ষ সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভকে একটি চমকপ্রদ আহবান জানান, 'মি. গর্বাচভ, গেটটি (ব্র্যান্ডেনবার্গ গেট) খুলে দিন। প্রাচীরের (বার্লিন প্রাচীর) কান্না শুনুন।' তবে বার্লিন প্রাচীরের পূর্ব প্রান্ত তথা পূর্ব জার্মানি এবং তাদের মিত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের মিডিয়ায় রোনাল্ড রিগ্যানের এই কান্নাকে অগ্নিসংযোগের সাথে তুলনা করা হয়। অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র পশ্চিম জার্মানি রোনাল্ড রিগ্যানের এই বক্তব্যকে জনমতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে অভিহিত করা হয়।

১৯৮৯ সালের নভেম্বর মাসে ঐতিহাসিক বার্লিন প্রাচীরের পতন হয়। পূর্ব জার্মানির সীমান্তরক্ষীরা জনতার ব্রান্ডেনবার্গ গেট খোলার চেষ্টা থামাতে ব্যর্থ হয়। পূর্ব জার্মানির জনস্রোত হাতুড়ি এবং বুলডোজার দিয়ে বার্লিন দেয়াল টুকরো টুকরো করে। এটি ছিল একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। যারা সরাসরি অথবা টেলিভিশন এবং রেডিওর মাধ্যমে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাদের সিংহভাগই বার্লিন প্রাচীরের পতন এবং পশ্চিম জার্মানি ও পূর্ব জার্মানির মধ্যে আনুষ্ঠানিক সীমান্ত বিলোপকে একটি বিজয় হিসেবে উদযাপন করে। পূর্ব জার্মানির কমিউনিস্ট সরকারকেও নীরবে এই ঘটনা মেনে নিতে হয়। চার দশক ধরে পুঁজিবাদ এবং সমাজতন্ত্রের নামে বার্লিন প্রাচীর কেবলমাত্র দুই জার্মানিকেই পৃথক করে রাখেনি; একইসাথে এই দুই মতাদর্শের প্রভাবে পৃথিবীকে দুইটি মেরুতে বিভক্ত করে রেখেছিল।

বৈশ্বিক রাজনীতির এই যুগসন্ধিক্ষণে ইউরোপীয় ইউনিয়ন তার সম্প্রসারণে মনোযোগ দেয়। পূর্ব ইউরোপ এবং সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের বহু রাষ্ট্র এ সময় ইইউ-তে যোগ দেয়। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং মেক্সিকো মিলে 'নর্থ আমেরিকা ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট' তথা নাফটা চুক্তি সম্পাদন করে। সাউথ আমেরিকায় মারকোসুর (সাউদার্ন কমন মার্কেট) নামক বাণিজ্যিক জোট গড়ে উঠে। এই বাণিজ্যিক জোটগুলো পূর্ববর্তী রক্তাক্ত বর্ডারের ইতিহাস মুছে দিয়ে বিশ্ববাসীকে অবাধ ও মুক্ত বাণিজ্যের পৃথিবীর স্বপ্ন দেখাতে শুরু করে। এ ছাড়াও ইউরোপীয় অঞ্চলে বাণিজ্যের পাশাপাশি পশ্চিমা ব্লকের রাজনৈতিক সম্প্রসারণও ঘটতে থাকে। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ইইউ এবং ন্যাটোতে সমানতালে যোগ দিতে শুরু করে। কেননা ১৯৪৯ সালে সম্পাদিত ন্যাটো চুক্তির ৫ নং অনুচ্ছেদ মতে, ন্যাটোর সদস্য কোনো দেশ আক্রান্ত হলে ন্যাটোভুক্ত সবগুলো দেশই আক্রান্ত দেশকে রক্ষায় এগিয়ে আসবে। সেসময় হলিউড এলিয়েন আক্রমণের মতো নতুন নতুন বিপদের ভবিষ্যদ্বাণী করছিল! তবুও ১৯৯০-এর দশকে এই রাষ্ট্রগুলো যেকোনো প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে যেন আশাবাদী মনোভাব ব্যক্ত করতো। ভাবখানা এমন যে, এলিয়েনরা আক্রমণ করলেও তারা আমেরিকার নেতৃত্বে সহজেই বিজয় অর্জন করতে পারবে। কিংবা মার্কিন মায়েরাই মানবজাতির বিলুপ্তি প্রতিরোধ করবেন (টার্মিনেটর ২: জাজমেন্ট ডে, ১৯৯১) অথবা ইন্ডিপেনডেন্স ডে (১৯৯৬)-এর মতো যুক্তরাষ্ট্রের দূরদর্শী প্রেসিডেন্টের নেতৃত্ব পৃথিবীকে এলিয়েন আক্রমণ থেকে রক্ষা করবে। ১৯৯০-এর দশকে এসব দেশের সীমানাগুলো নিয়ন্ত্রক প্রাচীরের কাজ করলেও প্রধান প্রবণতা ছিল : পণ্য, সেবা এবং উচ্চ দক্ষতার প্রবাহকে দ্রুতগামী করা।

বার্লিন প্রাচীরের পতন এবং সে সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন তথা 'লাল সাম্রাজ্যের' ভাঙন দীর্ঘসময় ধরে চলা স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ঘটায়। আধুনিকতা, গণতন্ত্র এবং পশ্চিমা সংস্কৃতির ছোঁয়া সমগ্র বিশ্বকে আন্দোলিত করতে শুরু করে। মার্কিন এবং সোভিয়েত ব্লকের মধ্যকার দ্বন্দ্বের আপাত অবসানে ১৯৯০ এর দশকে সাধারণ জনগণের মনে হতে থাকে যে, পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের মধ্যকার বিভাজন শীঘ্রই অদৃশ্য হয়ে যাবে। বৈশ্বিক গতিশীলতা এবং বাণিজ্যও একসময় সংকীর্ণ ভূরাজনৈতিক বাধা থেকে মুক্ত হবে বলে ধারণা করা

হচ্ছিল। ১৯৮০-এর শেষ থেকে ২০০০-এর শুরু পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে একটি বহুল আলোচিত বিষয় ছিল 'জিও-ইকোনমিক্স'। ইউরোপ এবং আমেরিকা ভিত্তিক বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন দেশে বিনিয়োগ এবং বাণিজ্যের প্রসার ঘটায়। একইসাথে বিশ্বজুড়ে মুক্তচিন্তার প্রচার করতে থাকে পশ্চিমা ব্লক। ১৯৯০ এর দশকে বাণিজ্যিক রূপে ইন্টারনেটের আগমন এই কাজে আরও গতিশীলতা আনে। ইন্টারনেট সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষকে একটি বন্ধনে আবদেকরে। অথচ ইন্টারনেটের আবিষ্কার হয়েছিল স্নায়ুযুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী ও সরকারের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের উদ্দেশ্যে। এই সামরিক অস্ত্রই পরবর্তীতে বিশ্ববাসীর অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। বৈশ্বিক যোগাযোগ, বাণিজ্য ও চিন্তার আদান-প্রদানের প্রধান মাধ্যম হয়ে ওঠে ইন্টারনেট।

হলিউডের মুভিতে অহরহ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের জয়জয়কার দেখানো হয়। কিন্তু ১৯৯০ এর দশকে হলিউড মুভির চেয়েও দ্রুতগতিতে মার্কিন আধিপত্য বিস্তৃত হতে থাকে। পণ্যদ্রব্যের অবাধ আমদানি-রপ্তানি, জনশক্তি রপ্তানি এবং ফ্রিল্যান্সিং সার্ভিস কার্যত বিশ্বকে একটি বিশ্বগ্রামে পরিণত করে। বিভিন্ন দেশের মাঝে থাকা সীমান্তগুলোকে তখন কেবলই কিছু পিলারের সমষ্টি মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যেন ভবিষ্যৎ বিশ্বে সীমান্ত বলে কিছু থাকবে না। তবে কিছু কিছু হলিউড মুভিতে অবশ্য এই অবাধ যাতায়াতের নেতিবাচকতাও তুলে ধরা হতো। যেমন, ২০০০ সালে মুক্তি পাওয়া ট্রাফিক মুভিতে অবাধ সীমান্তের সুযোগ নিয়ে মাদক এবং সন্ত্রাসী কার্যক্রমের ব্যাপকতা তুলে ধরা হয়েছিল। তবে অবাধ সীমান্তের এই নেতিবাচকতা মানুষকে সেভাবে স্পর্শ করতে পারেনি। কিন্তু এরপরই ৯/১১-এর ঘটনাপ্রবাহ বিশ্ব রাজনীতি এবং বৈশ্বিক সম্পর্কে এক আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্রুতই তার অবাধ যাতায়াতের নেতিবাচকতা উপলব্ধি করতে পারে। হলিউডও তার মুভির কাহিনি ও দৃশ্যপট পরিবর্তন করতে শুরু করে দেয়। সেখানে বিশ্বগ্রাম ও অবাধ যাতায়াতের বদলে জিওপলিটিক্স এবং স্ট্রং বর্ডারকে গুরুত্ব দিয়ে মুভি বানাতে শুরু করে। এই প্রেক্ষাপটে ২০০০ সালের প্রথম দশকে হলিউডের বেশিরভাগ মুভিই ছিল সেমি-হিস্টোরিক। এই মুভিগুলোতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা রক্ষার্থে অবৈধ অভিবাসী প্রতিহত করার বার্তা দেয়া হতো। তবে ৯/১১-এর হামলাকারীরা কিন্তু অবৈধভাবে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসে নি।

সৌদির প্রভাবশালী নাগরিকরা ৯/১১-এর হামলার সাথে জড়িত ছিলো এবং তাদের অনেকেই বৈধভাবে দীর্ঘদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করতো। তবুও এই ঘটনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ঝুকিপূর্ণ সীমান্তগুলোতে কঠোর নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। তারা একইসাথে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তায় বিশেষ গুরুত্ব দিতে থাকে। দেশটি নিজ ভূখণ্ডের পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যজুড়েও সন্ত্রাসী দমনের নামে 'ওয়ার অন টেরর' নামক একটি অসম যুদ্ধ শুরু করে। এই যুদ্ধে ২০০১-১৯ সালের মধ্যে দেশটির প্রায় ৬.৪ ট্রিলিয়ন ডলার ব্যয় হয়। এই যুদ্ধের বলি হিসেবে আফগানিস্তান, ইয়েমেন এবং ইরাকে ৮ লাখ বনি আদম শহীদ হন। বাস্তুচ্যুত হয় প্রায় দুই কোটি আরব এবং আফগান। এই ওয়ার অন টেরর আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের সার্বভৌমত্বকেও বিলীন করে। পাকিস্তান সীমান্তে জঙ্গি দমনের নামে বহু নিরীহ জনসাধারণকে ড্রোন হামলা চালিয়ে হত্যা করা হয়। তবে নিজ সুরক্ষার জন্য অন্য রাষ্ট্রে হামলা কিংবা দখলদারিত্ব কেবলমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই করেনি। ৯/১১-কে বাহানা বানিয়ে অন্যান্য পরাশক্তি তথা রাশিয়া এবং চীনও তাদের আশেপাশের দেশ কিংবা নিজ ভূখণ্ডের ভিন্ন জাতিসত্তার জনগণের উপর নির্যাতনের স্টিম রোলার চালিয়েছে।

ওয়ার অন টেররের ধোঁয়া তুলে পরাশক্তিগুলো বিভিন্ন জাতিসত্তার স্বাধিকারকে ধামাচাপা দিতে উৎসাহী হয়ে ওঠে। এসময় মুক্ত সীমান্ত ধারণাও পুরোপুরি কবরস্থ হয়ে যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি রাশিয়া এবং চীন নিজস্ব সীমান্তকে অধিক সুরক্ষিত করতে শুরু করে। মূল ভূখণ্ডের নিরাপত্তার অজুহাত দিয়ে রাশিয়া পার্শ্ববর্তী চেচনিয়া, ক্রিমিয়া এবং জর্জিয়ার একাংশসহ বিভিন্ন অঞ্চল দখল করে নেয়। চীন সংখ্যালঘু উইঘুর মুসলিম জাতিগোষ্ঠীকে সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করে। এরপরই উইঘুরদের নিজ ভূখণ্ড থেকে উচ্ছেদ করে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো হয়। চীনের পশ্চিমাঞ্চলীয় শিনচিয়াং প্রদেশে প্রায় ১১ মিলিয়ন উইঘুর মুসলিমের বসবাস। মধ্য-এশিয়া এবং মঙ্গোলিয়া সংলগ্ন এই শিনচিয়াং প্রদেশটি ভৌগোলিকভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অতীতেও শিনচিয়াংয়ের উইঘুর মুসলিমদের যেকোনো দাবিকে চীন কঠোরভাবে দমন করত। ৯/১১র আগে চীনের এই দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক মিডিয়া এবং বুদ্ধিজীবীরা সোচ্চার থাকলেও কিন্তু ৯/১১-এর পর দৃশ্যপট পাল্টে যায়। চীন উইঘুরদের আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের জন্য

অভিযুক্ত করে। একইভাবে রাশিয়াও চেচনিয়া অঞ্চলের মুসলিম জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতার আন্দোলনকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী কার্যক্রম হিসেবে চিহ্নিত করে।

এভাবে বিশ্বব্যাপী অসংখ্য সীমান্ত বিগত ১৫ বছর নতুন করে খবরের শিরোনাম হচ্ছে। সামরিকতন্ত্র, সন্ত্রাসবাদ, জলবায়ু পরিবর্তন, অভিবাসন এবং সর্বশেষ করোনা মহামারীর কারনে সীমান্ত সমস্যা খবরের শিরোনাম হচ্ছে। এসব সীমান্ত নিয়ে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর প্রতিরক্ষামূলক কার্যক্রমে চারটি প্রধান নিয়ামক স্পষ্ট হচ্ছে। সেগুলো হলো : সংকোচন, সম্প্রসারণ, প্রতিহতকরণ এবং বহিষ্কার।

ক. সংকোচন

বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন উন্নত দেশ তাদের অভিবাসন নীতিকে কঠোর থেকে কঠোরতর করে অভিবাসন কমানোর চেষ্টা করছে। এই নীতিকে বলা হচ্ছে সংকোচন। বহিরাগতদের জন্য বিধিনিষেধ নতুন কিছু নয়। তবে বর্তমানে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, সরকারি নিয়োগ বোর্ড এবং নাগরিক মনিটরিং কার্যক্রমে নানা কৌশলে যুক্ত করা হচ্ছে। নতুন শতাব্দীতে এসে বহিরাগত নাগরিকদের প্রতিহত করতে প্রতিটি দেশই নিজ নাগরিকদের ডাটাবেইজ পূঙ্খানুপুঙ্খ সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাসা ভাড়া নেয়ার ক্ষেত্রেও বহিরাগত নাগরিকদের জন্য কঠোর নিয়মের ব্যবস্থা রয়েছে। নিয়ম বহির্ভূতভাবে কোনো বহিরাগতকে ভাড়া দিলে বিভিন্ন দেশ সংশ্লিষ্ট বাড়িওয়ালাকে আইনের আওতায় নিয়ে আসে।

যেমন, যুক্তরাজ্যে বাড়ির মালিকরা 'অবৈধ অভিবাসী'-দের ভাড়া দেওয়ার বিষয়ে হোম অফিসকে না জানালে তাদের বড় ধরনের আর্থিক জরিমানা করা হয়ে থাকে। এ ছাড়াও, প্রতিটি দেশেই সরকারি নিয়োগে চাকরি প্রার্থীদেরকে তাদের নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে হয়। মোদি জমানায় ভারতে এনআরসি এবং সিএএ বিলের মাধ্যমে বহিরাগত অ-হিন্দু নাগরিকদের চলাচল সীমিত করা হয়েছে। এই কড়াকড়ির জন্য দেশটিতে বৈধভাবে থাকা বিদেশিদেরও প্রতিনিয়ত তল্লাশির মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে। ভারতের পাশাপাশি আরও অনেক দেশে বিভিন্ন ডানপন্থী সরকার সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটাচ্ছে। এই দেশগুলোর জনগণ মনে করছে, বহিরাগত নাগরিকরা তাদের দেশ থেকে সম্পদ লুটে নিয়ে বিদেশে পাচার করে। কোনো লেখক, বুদ্ধিজীবী, পত্রিকা এবং মিডিয়ার জন্য এই পপুলিস্ট ধারণার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ প্রায় অসম্ভব। তাই বর্তমান

বিশ্বে সীমান্তে কড়াকড়ির আরোপের অন্যতম অনুষঙ্গ হচ্ছে এই সংকোচনবাদ। বহিরাগতদের জন্য স্ব স্ব দেশ নিজেদেরকে কঠোর থেকে কঠোরতম করার মধ্য দিয়ে অভিবাসনকে শূন্যের কোটায় নিয়ে আসতে চায়।

খ. সম্প্রসারণ

সম্প্রসারণ কীভাবে অভিবাসীদের জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, তা বুঝতে যুক্তরাজ্যের উইন্ডরাশ প্রজন্ম একটি ভালো উদাহরণ হতে পারে। উইন্ডরাশ প্রজন্ম বলতে ১৯৪৮ সালে এইচ.এম.টি. এম্পায়ার উইন্ডরাশ নামক জাহাজে করে ব্রিটেনে আসা ক্যারিবিয়ান অভিবাসীদের একটি গোষ্ঠীকে বোঝানো হয়ে থাকে। এই জাহাজটি ব্রিটেনে প্রথমবারের মতো বহু ক্যারিবীয় অভিবাসীকে নিয়ে আসে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটেনে শ্রমিকের অভাব দেখা দিয়েছিল। দেশ পুনর্গঠনে এই অভিবাসীদের শ্রমিক হিসেবে আনা হয়। এই অভিবাসীরা ব্রিটেনের অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্বাস্থ্যসেবা, পরিবহন এবং অন্যান্য জনসেবামূলক কাজে উইন্ডরাশ প্রজন্মকে কাজে লাগানো হয়। তারাও ব্রিটেনে বসবাস শুরু করে এবং একটি সুন্দর সামাজিক জীবন গড়ে তুলেছিল। কিন্তু ব্রিটেনে তাদের অভিজ্ঞতা কখনোই মসৃণ ছিল না। বর্ণবাদ, বৈষম্যের শিকার হওয়ার পাশাপাশি সামাজিক অগ্রাধিকার থেকে তারা প্রায়শই বঞ্চিত হতো। উইন্ডরাশ প্রজন্ম ২০১০ সালের শেষের দিকে আবার আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠে। সরকারি সংস্থা ব্রিটেনে বসবাসরত উইন্ডরাশ প্রজন্মের সদস্যদের অবৈধ অভিবাসী হিসেবে ভুলভাবে চিহ্নিত করে। অনেককে আটকও করা হয়। বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে তাদেরকে ডানপন্থী গোষ্ঠীগুলো দেশছাড়া করার হুমকি দিচ্ছিল। বাস্তবেও অনেককে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হয়। এসব ঘটনা ব্রিটেনের অভিবাসন নীতিতে একটি বড় রাজনৈতিক কেলেঙ্কারি তৈরি করেছিল। অবশেষে সরকারের পক্ষ থেকে দুঃখপ্রকাশ করা হয় এবং ক্ষতিগ্রস্তদের পুনরুদ্ধারের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়। কিন্তু জাতীয়তাবাদী, বর্ণবাদী এবং ডানপন্থীদের মতে, ব্রিটেন 'অভিবাসীদের দ্বারা প্লাবিত' হচ্ছে। অর্থাৎ কাজের বেলায় কাজী, কাজ ফুরালে পাজী! ইউএস-মেক্সিকো সীমান্ত অঞ্চলেও এই সম্প্রসারণবাদের প্রভাব দেখা যায়। ইউএস-মেক্সিকো সীমান্তে অবৈধ অভিবাসী শ্রমিকরা বিভিন্ন সেক্টরে স্বল্প

মূল্যে কাজ করে থাকে। আমেরিকার কৃষি এবং সেবা খাতের জন্য এই শ্রমিকরা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই অবৈধ মেক্সিকান অভিবাসীদের থেকে শ্রম ও সেবা নিতে ইচ্ছুক হলেও এই অবৈধ অভিবাসীদের বৈধ করতে ইচ্ছুক না। কেননা তা হলে এই ‘দ্বিতীয়’ শ্রেণির মানুষদের আর স্বল্প মূল্যে খাটানো যাবে না। এছাড়াও তাদেরকে তাদের নাগরিক অধিকার দিতে হবে।

কিছু উদারপন্থী মানুষ অভিবাসীদের স্বাগতম জানালেও বাদবাকিরা তাদের নির্বাসিত করতে চায়। অভিবাসীরা সীমান্তকে একটি প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দেখলেও সীমান্ত এলাকার মানুষজন এটিকে অর্থ উপার্জনের সুযোগ হিসেবে দেখে থাকে। উন্নত দেশগুলো মূলত তার পাশ্ববর্তী অনুন্নত দেশের নাগরিকদের সাথে সম্প্রসারণবাদী কার্যক্রমে জড়ায়।

গ. প্রতিহতকরণ

প্রতিহতকরণ মানে হলো, সীমান্তে অভিবাসীদের মানবাধিকার এতটাই হ্রাস করা যাতে অন্যান্য গৌণ মৌলিক বিষয়গুলো থেকে আন্তর্জাতিক মনোযোগ সরে যায়। যেমন, অভিবাসীদের জন্য শুধুমাত্র আশ্রয়ণ প্রকল্প এবং ত্রাণকে গুরুত্ব দেয়া হয়। কিন্তু অভিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য চাষাবাদ এবং পর্যাপ্ত সেবা পাওয়ার অধিকারকে সংকুচিত করে রাখা হয়। রাজনৈতিক বামপন্থী এবং উদারপন্থীরা সীমান্তে এই মানবতাবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সরব থাকলেও রাজনৈতিক ডানপন্থী এবং জাতীয়তাবাদীদের মতে, সীমান্ত দেশের সার্বভৌমত্বের হটস্পট এবং তাই সীমান্তেই অভিবাসনে ইচ্ছুকদের নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।

ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার অনেক খাতেই অভিবাসী শ্রমিকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু নতুন আইনকানুনের জন্য যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের অনেক জায়গায় অভিবাসীদের আশ্রয় গ্রহনও কঠিন হয়ে পড়েছে। ট্রাম্প প্রশাসন মার্কিন নাগরিকত্বের জন্য আপিল করা দক্ষিণ সীমান্তের শরণার্থীদের মেক্সিকোতে রাখার জন্য চাপ দিচ্ছে। এছাড়াও গুয়াতেমালার মতো অন্যান্য কিছু দেশকে ‘সুরক্ষিত তৃতীয় দেশ’ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। আমেরিকায় আশ্রয় লাভের আবেদন করা ব্যক্তিদের এই তৃতীয় দেশগুলিতে আপিল চলাকালীন আশ্রয় নিতে হবে। ট্রাম্প প্রশাসন গুয়াতেমালা, হন্ডুরাস এবং এল সালভাদরের সাথে নতুন অভিবাসন চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। বিনিময়ে